# গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা www.gunijan.org.bd


## সম্পাদকীয়

গুণীজন বহুদিন ধরেই চেষ্টা করে আসছে দেশের গুণী ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরার। নতুন প্রজন্ম তাদের দেশের সেরা সন্তানদের চিনে নিতে শিখবে—এটাও গুণীজন ট্রাস্টের একটি উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শিক্ষা, সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, গণমাধ্যম, নারী অধিকার আন্দোলন, মুক্তিসংগ্রাম ইত্যাদি) গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প, তাঁদের অবদান, বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্রের সমন্বয় করার চেষ্টা করছি আমরা। এখন অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সেটাও কাজে লাগানো হচ্ছে। 'গুণীজন' কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নতুন প্রজন্মের মাঝে বিতরণ করার জন্য ২০০৯ সাল থেকে 'গুণীজন' পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের সংখ্যায় চারজন সাহিত্যিকের জীবনী থাকছে। তাঁরা হলেন আল মাহমুদ, জিয়া হায়দার, যতীন সরকার ও দিলওয়ার খান।

ব্র্যাক ব্যাংক আমাদের এবারের সংখ্যাটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছে। 'গুণীজন' কর্তৃপক্ষ তাঁদের এই উদ্যোগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আশা করছে, ভবিষ্যতেও তাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমাদের এই প্রয়াস স্বার্থক হয়ে উঠবে তখনই, যখন তরুণ প্রজন্ম তাঁদের পূর্বসূরীদের সৃজনশীলতার সঙ্গে পরিচিত হবে এবং তাতে তাদের নিজেদের চলার পথ নির্ধারণ করা সহজ হয়ে উঠবে।

# আল মাহমুদ

১৯৫৪ সালের এক শীতের সকাল। ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে ট্রেন থেকে নামলেন সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ ১৮ বছরের এক যুবক। পরনে খদ্দরের জামা ও পাজামা, পায়ে রাবারের স্যান্ডেল আর বগলের নিচে ভাঙা টিনের একটা সুটকেস, যার গায়ে গোলাপ ফুল আঁকা। এক ঝলক তাকালেই বোঝা যায় নিতান্তই মফস্বলের এক যুবক কোন এক দুর্বিপাকে এখানে এসে উঠেছে। তাঁর মুখের রেখায় ফুটে উঠেছে শ্রান্তির চিহ্ন কিন্তু চোখ জোড়া সাক্ষ্য দিচ্ছে যুবকের পেছনে কোন সেনাবাহিনী থাকলে তাঁর নির্ভীক দৃষ্টিই ঘোষণা করত বিজয় বার্তা।

তখন '৫২-র ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী উত্তুঙ্গ সময়। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে যাঁরা জড়িয়ে পড়েছে, পাকিস্তান সরকারের পুলিশ তাঁদেরকে দমিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, বিভিন্নভাবে মামলা দিয়ে তাঁদেরকে হয়রানি করার চেষ্টা করছে। যুবক তাঁদেরই একজন। যুবকের অপরাধ তিনি একজন কবি এবং '৫২-র ভাষা আন্দোলনের ঢেউ মফস্বল শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আছড়ে পড়লে যুবক এতে নিজেকে জড়িয়ে নেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও গঠিত হয়েছিলো ভাষা কমিটি এবং ভাষা কমিটির একটি লিফলেটে তাঁর চার লাইন কবিতা উদ্ধৃত করা হয়। আর সেই অপরাধে মীর আব্দুশ শাকুর আল মাহমুদের ফেরার হয়ে দশম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় ঢাকায় আগমন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি।

ঢাকায় এসে আল মাহমুদ তাঁর এক পূর্ব পরিচিত'র মাধ্যমে পরিচিত হন রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাইয়ের সাথে। আল মাহমুদের যখন জীবিকার প্রয়োজনে একটি চাকরি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে দাদাভাই তখন আল মাহমুদকে ১৯৫৪ সালে দৈনিক মিল্লাত'-এর প্রুফ সেকশনে প্রুফ রিডারের চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। পরবর্তীতে তিনি নিজের চেষ্টায় 'সাপ্তাহিক কাফেলা'-য় সহসম্পাদক পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর দৈনিক ইত্তেফাকে যোগ দেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে মফস্বল বিভাগে বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর পর আসে ১৯৭১ সাল। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আসে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে 'দৈনিক গণকণ্ঠ' নামের একটি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব হাতে তুলে নেন। আল মাহমুদের সংবাদ প্রকাশের স্টাইল ও সাহসী সম্পাদকীয় দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করে। বিপরীত দিকে পত্রিকাটি পরিণত হয় শাসক গোষ্ঠীর চক্ষুশূলে। ফলে, ১৯৭৩ সালে তিনি কারাবরণ করেন। তাঁর আটকাবস্থায় সরকার দৈনিকটিও বন্ধ করে দেয়। ১৯৭৫-এ তিনি মুক্তি পান। তাঁর কবি খ্যাতি ততদিনে পৌঁছে গিয়েছিলো রাষ্ট্রপতির বাসভবন পর্যন্ত। কারামুক্তির পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে ডেকে শিল্পকলা একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগের সহপরিচালক পদে নিয়োগ দেন। ১৯৯৩ সালে তিনি ওই বিভাগের পরিচালকরূপে অবসর নেন। চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে তিনি আবার ফিরে যান সাংবাদিকতা পেশায়। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক কর্ণফুলি'-র সম্পাদক হিসেবে বেশ কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। বার্ধক্যে উপনীত কবি বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

আল মাহমুদ জন্মেছিলেন ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই এক বর্ষণমুখর রাতে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল গ্রামের মাতুলালয় মোল্লা বাড়িতে। পিতা আব্দুর রব মীরের ছিল কাপড়ের ব্যবসা। পরবর্তীতে বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসের অফিসার। মা রৌশন আরা বেগম ছিলেন গৃহিনী। প্রকৃত অর্থে গৃহশিক্ষক শফিউদ্দিন আহমদই তাঁকে নিয়ে যান পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অনাস্বাদিত এক গ্রন্থভুবনে। সেই খুব ছোটবেলায় যখন তিনি স্কুলের চৌকাঠ মাড়াননি, এমনকি ঠিকমতো পড়তেও পারেন না, বানান করে করে সবেমাত্র পড়তে শিখছেন, তখনই শফিউদ্দিন আহমদ তাঁকে রাত জেগে জেগে পড়ে শোনাতেন ঠাকুরমার ঝুলি। আর আল মাহমুদ ছোটবেলাতেই আস্তে আস্তে উপলব্ধি করেন বাল্যশিক্ষার জঞ্জালের বাইরেও বইয়ের একটি বিশাল জগৎ রয়েছে। এই উপলব্ধিই পরবর্তীতে তাঁকে বানিয়েছে কবি, ভাবুক, পাখির মতো বন্য। ফলে প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর আগেই শিখে ফেলেছিলেন স্কুল পালানো। স্কুল পালিয়ে লোকনাথ পার্কের বিশাল কড়ই গাছের নিচে শুয়ে শুয়ে দেখতেন পাখিদের খুনসুটি, নীলিমার নীল, বৃষ্টির পতন।

জর্জ হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পর অবশ্য তাঁর স্কুল পালিয়ে সময় কাটানোর জায়গা পরিবর্তন হয়ে যায়। একদিন তাঁর পাঠতৃষ্ণা তাঁকে পায়ে পায়ে নিয়ে যায় লালমোহন পাঠাগারে। লালমোহন পাঠাগারটি ছিলো মূলত তখনকার নিষিদ্ধ ঘোষিত কম্যুনিস্ট পার্টির একটি পাঠকেন্দ্র। শহরের প্রগতিশীল চিন্তাধারার লোকেরা এই পাঠাগারে এসে ভাব বিনিময় করত। আবার মার্কসবাদী আন্দোলনও পরিচালিত হত এখান থেকেই। এই পাঠাগারেই আল মাহমুদ কিশোর বয়সে পড়েন ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি, ইতিহাসের ধারা ও ডারউইনের বিবর্তনবাদ বিষয়ক বইগুলি। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা রক্ষায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যে ভাষা কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটির অনেকেই ছিলেন লালমোহন পাঠাগারের সদস্য। আর সেই সূত্র ধরেই ভাষা কমিটির লিফলেটে তাঁর চার লাইন কবিতা উদ্ধৃত হয়েছিল।

তিরিশোত্তর বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ১৯৫৪ সালে ঢাকা আগমনের পূর্বেই তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো কলকাতার 'সাহিত্য', 'চতুষ্কোণ', 'চতুরঙ্গ', 'ময়ূখ ও কৃত্তিবাসে'। সেই সুবাদে ঢাকা ও কলকাতার পাঠকদের কাছে তাঁর নাম সুপরিচিত হয়ে ওঠে। কবি আল মাহমুদের কবি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে একটি চিঠি। কলকাতার রাসবিহারী এভিন্যুর কবিতাভবনের স্মৃতিচিহ্ন আঁকা সাদা পোস্টকার্ডটির প্রেরক ছিলেন 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক কবি বুদ্ধদেব বসু। 'কবিতা' পত্রিকার জন্য আল মাহমুদ তিনটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন তারই প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়েছিলেন বুদ্ধদেব এভাবে- 'প্রীতিভাজনেষু, তোমার একটি বা দু'টি কবিতা ছাপা যাবে বলে মনে হচ্ছে।' একটি মাত্র বাক্য। কিন্তু ১৯৫৫ সালে বাংলাভাষার একজন নবীন কবির জন্য এটি ছিলো অসাধারণ প্রেরণা ও স্বীকৃতির বিষয়। যেন এক দৈববাণী। পরবর্তীতে চৈত্র সংখ্যায় আল মাহমুদের তিনটি কবিতাই ছাপা হয়েছিলো। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি আল মাহমুদকে। বাংলা কবিতার ভাঁড়ারে আল মাহমুদ একের পর এক যুক্ত করে গেছেন, যাচ্ছেন অজস্র সোনালি শস্য, সাফল্যের পালক। আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি তিরিশ দশকীয় প্রবণতার মধ্যেই ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীন দৃশ্যপট, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের কর্মমুখর জীবন চাঞ্চল্য ও নর-নারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহের বিষয়কে অবলম্বন করেন। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যেই অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় আঞ্চলিক শব্দের সুন্দর প্রয়োগে আল মাহমুদ কাব্যরসিকদের মধ্যে নতুন পুলক সৃষ্টি করেন। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর' এবং ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'কালের কলস'। এ দু'টি কাব্যের ভেতর দিয়ে আল মাহমুদ নিজেকে প্রকাশ করেন সম্পূর্ণ মৌলিক ও নিজস্ব ঘরানার কবি হিসেবে। তাঁর তৃতীয় কাব্য 'সোনালী কাবিন' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। 'সোনালী কাবিন' কাব্যে আল মাহমুদ লোকজ ও আঞ্চলিক শব্দের সমন্বয়ে উদ্ভাবন করেন এক ধরণের শব্দ জাদুময়তার। 'আমার ঘরের পাশে ফেটেছে কি কার্পাশের ফল?/গলায় গুঞ্জার মালা পরো বালা, প্রাণের শবরী,/কোথায় রেখেছো বলো মহুয়ার মাটির বোতল/নিয়ে এসো চন্দ্রালোকে তৃপ্ত হয়ে আচমন করি।/ব্যাধের আদিম সাজে কে বলে যে তোমাকে চিনবো না/নিষাদ কি কোনদিন পক্ষিণীর গোত্র ভুল করে? এই শব্দ জাদুময়তার ভেতর দিয়ে আল মাহমুদ তাঁর পাঠকদেরকে চমকিত করে যাচ্ছেন গত পঞ্চাশ বছর ধরে। 'সোনালী কাবিন' আল মাহমুদকে এনে দিয়েছে তুমুল কবি খ্যাতি।

১৯৫৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'সত্যযুগ' পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘদিন গল্প লেখায় বিরতি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে দৈনিক 'গণকণ্ঠ' সম্পাদনার সময় তিনি বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন। গল্পগুলো প্রকাশিত হলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেন তিনি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিই নন, অন্যতম গল্পকারও। ১৯৭৫-এ তাঁর প্রথম ছোটগল্পের সংকলন 'পানকৌড়ির রক্ত' প্রকাশিত হয় এবং বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পায়। 'পানকৌড়ির রক্ত'-র পর তিনি 'সৌরভের কাছে পরাজিত', 'গন্ধবণিক', 'ময়ূরীর মুখ'সহ প্রায় দশটি গল্পগ্রন্থ লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তাঁর উপন্যাস 'কাবিলের বোন ও উপমহাদেশ' উপন্যাস দু'টি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে শুধু ঋদ্ধই করেনি সংযোজনও করেছে ভিন্নমাত্রা।

১৯৫৪ সালে যে যুবকটি রাবারের স্যান্ডেল পায়ে ঢাকায় পদার্পণ করেছিলেন কেবল কবিতাকে অবলম্বন করে, সে আজ বার্ধক্যে নুয়ে পড়া এক জ্ঞানবৃদ্ধ। জীবনের কত কিছুকে তিনি পেছনে ফেলে এসেছেন, কত কিছু তাঁকে ফেলে রেখে চলে গেছে। কিন্তু কবিতাকে তিনি যেমন ফেলে দেননি তেমনি কবিতাও তাঁকে ফেলে দেয়নি। আল মাহমুদ আর কবিতা একই সংসারে বাস করছেন আজ পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় ধরে। আর সেই সংসারে আরও আছেন কবির স্ত্রী সৈয়দা নাদিরা বেগম। কবি দম্পতির পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা।

*লেখক : এহসান হাবীব*


সহযোগিতায়:
BRAC BANK

# দিলওয়ার খান



সিলেটের রাজা গিরিশ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন দিলওয়ার খান। শিক্ষক মুসলিম মিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলার কৃষক নিয়ে একটি লেখা জমা দিতে বললেন। শিক্ষক একে একে লেখাগুলো দেখলেন। সব শেষে একটা খাতা হাতে নিয়ে নিবিষ্ট মনে লেখাটি পড়লেন। কৃষকের ফসল তোলার সোনালি হাসি, উগার (ধান সংরক্ষণের বস্তু) ভরা ধান, বন্যায় ফসল তলিয়ে যাওয়ার করুণ কান্না, নবান্ন উৎসব, কৃষকের স্বপ্ন, ক্ষেতের আল, লাঙ্গল-কাঁচি, গোয়াল ঘর, লাল দামা, দুধের গাভী আর বাছুরের ইড়িং-বিড়িং নাচ, এক ভোরে কৃষক উঠে দেখে লাল দামাটি গোয়াল ঘরে চার পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। দামাটির নিথর দেহ দেখে কৃষকের ছেলের কান্না আর থামে না- সব মিলিয়ে গ্রাম-বাংলার কৃষকের আসল রূপ উঠে এসেছে বাংলার কৃষক বিষয়ক পলখাটিতে। প্রবন্ধটি পড়া শেষে শিক্ষক দেখলেন নীচে লেখা মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী।

শব্দের নিখুঁত গাথুনি আর আবেগ-বাস্তবতায় শিক্ষকের হৃদয় ছুঁয়ে গেল। মুসলিম মিয়া ইশারা করে মৃণালকে দাঁড়াতে বললেন। মৃণাল দাঁড়িয়ে বললো স্যার লেখাটি আমার নয়, এটা দিলু লিখেছে। দিলু অর্থাৎ দিলওয়ার খানকে কাছে টেনে নিলেন স্যার এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে দোয়া করলেন।

এরপরের ঘটনা। দিলওয়ার খান তখন ৫১-৫২ শিক্ষাবর্ষের এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী। তখন মারফি রেডিও খুব কম সংখ্যক মানুষের ঘরে থাকলেও দিলওয়ারের ঘরে মারফি রেডিও ছিলো। তখন বিবিসি'র অনুষ্ঠানগুলো ছিলো খুব জনপ্রিয়। বিবিসি থেকে 'পাকিস্তানের কমনওয়েলথে থাকা উচিত কিনা?' বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতার ঘোষণা দেওয়া হল। প্রিয় শিক্ষক দীপেন্দ্র চক্রবর্তী তাঁকে ডেকে এতে অংশগ্রহণের পরামর্শ দিলেন। দিলওয়ার তা লেখার পর শিক্ষক নিজ হাতে লেখাটি পাঠিয়ে দিলেন বিবিসি বরাবরে। সব প্রতিযোগীকে ছাড়িয়ে দিলওয়ার খান প্রথম পুরষ্কার হিসেবে একটি মারফি রেডিও জিতে নিলেন। ওই দিন ছাত্রের বিজয়ে দীপেন্দ্র চক্রবর্তী স্যার খুব খুশি হয়েছিলেন।

মুসলিম মিয়া এবং দীপেন্দ্র চক্রবর্তী শিক্ষকের অতি প্রিয় ছাত্র দিলওয়ার খান পরবর্তীতে বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তবে গণমানুষের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ এই কবি জনমনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া খান উপাধি বাদ দেন এবং গণমানুষের কবি দিলওয়ার নামে সবার কাছে পরিচিতি লাভ করেন।

সিলেট জেলার সুরমা নদীর দক্ষিণ পারে ভার্থখলা গ্রামে একটি রক্ষণশীল পরিবারে ১৯৩৭ সালের ১ জানুয়ারী কবি দিলওয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভী মোহাম্মদ হাসান খান আর মা রহিমুন্নেছা। দিলওয়ার চার ভাই ও চার বোনের মধ্যে সপ্তম। তাঁর প্রিয় নদী সুরমার সাথে খেলা করে আর জন্মস্থানের অবাধ প্রকৃতির দৃশ্য অবলোকন করে তাঁর শৈশবের দিনগুলি কেটেছে।

দিলওয়ারের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় সিলেটের দক্ষিণসুরমাস্থ ঝালপাড়া পাঠশালায়। সিলেটের উত্তরসুরমাস্থ রাজা জি.সি. হাইস্কুল থেকে ১৯৫২ সালে তিনি প্রবেশিকা পাশ করেন। সিলেট এম.সি. কলেজ থেকে ১৯৫৪ সালে তিনি পাশ করেন ইন্টারমিডিয়েট। এরপর শারীরিক অসুস্থতা বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় তাঁর শিক্ষা জীবনে। এখানেই ইতি ঘটে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার। এরপর অবতীর্ণ হন জীবনযুদ্ধের মাঠে। শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্ম জীবন শুরু করেন। তবে ভেতরের কবিসুলভ উতলা মন স্থির হয়নি সেখানে। দুই মাস ছিলো তাঁর শিক্ষকতা জীবনের বয়স। এরপর পাড়ি জমান ঢাকায়। শব্দের কারিগর শব্দ নিয়ে খেলা করার লোভে জড়িয়ে পড়েন সাংবাদিকতায়। ১৯৬৭ সালে তিনি দৈনিক 'সংবাদ'-এর সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন।

সেখানে দু'বছর কাজ করার পর ফিরে আসেন সিলেটে। দেশ তখন উন্মাতাল, বাঙালীরা জাগতে শুরু করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সিলেটে-এর পথ দেখানোর দায় তুলে নেন কবি নিজের কাঁধে। গড়ে তোলেন 'সমস্বর লেখক ও শিল্পী সংস্থা'। উনসত্তরের উন্মাতাল হাওয়ায় এই সংগঠন সিলেটে চেতনার রসদ যুগিয়েছিলো। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধেও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে এই সংগঠন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি চলে আসেন ঢাকায়। ১৯৭৩-৭৪ সালে দৈনিক 'গণকণ্ঠ'-এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকাস্থ রুশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত মাসিক 'উদয়ন' পত্রিকার সিনিয়র অনুবাদক হিসেবে প্রায় দুই মাসের মতো কাজ করেন। এরপর তিনি স্বেচ্ছায় সেই চাকুরীটি ছেড়ে দেন। কারণ ঢাকায় তাঁর মন টেকেনি। আবার ফিরে আসেন সুরমার তীরে। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়েন। গতি পায় তাঁর লেখালেখি। ঢাকা-সিলেটের পত্র-পত্রিকায় সমান তালে তাঁর লেখা প্রকাশ হতে থাকে।

তাঁর কলমটা জোর গতিতে চলতে থাকলেও দেহটাতে কবি সেভাবে গতি পাননি কখনো। চিকিৎসার সূত্রে পরিচয় হয় উর্দুভাষী সিনিয়র স্টাফ নার্স আনিসা খাতুনের সাথে। পরিচয় থেকে হয় প্রেম। কিন্তু প্রেমের শুরু থেকেই তাঁদের সামনে এসেছে অনেক বাধা। কারণ দিলওয়ারের পরিবারে আনিসা গ্রহণযোগ্য ছিলেন না, প্রথমত আনিসার পেশাগত কারণ এবং দ্বিতীয়ত আনিসা বহিরাগত বলে। কিন্তু তাঁরা সব বাধা অতিক্রম করে ১৯৬০ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর আনিসা খাতুন হয়ে গেলেন আনিসা দিলওয়ার।

আনিসা ও কবি দিলওয়ারের ঘরে জন্ম নেয় ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বড় ছেলে শাহীন ইবনে দিলওয়ার। এরপর জন্ম নেন কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার। তারপর নাহিদ বিনতে দিলওয়ার, রোজিনা বিনতে দিলওয়ার, সাজিয়া বিনতে দিলওয়ার। সবার ছোট কামরান ইবনে দিলওয়ার।

১৯৭৫ সালে দূরারোগ্য ব্যাধি টিটেনাসে আক্রান্ত হয়ে আনিসা দিলওয়ার ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন সংসারের হাল ধরার জন্যে আসেন আনিসারই সহোদরা ওয়ারিসা খাতুন। ওয়ারিসা খাতুন ১৯৭৫ সালেই কবির সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাঁর মরহুমা বোনের সন্তানদের দেখার দায়িত্ব নেন। ওয়ারিসা ও কবি দিলওয়ারের ঘরে জন্ম নেয় এক মেয়ে ও দুই ছেলে। মেয়ে নওশাবা বিনতে দিলওয়ার শৈশবেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। দূরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ওয়ারিসা খাতুনও কবিকে ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করেন ২০০৩ সালে।

১৯৪৯-৫০ সালের দিকে কবি দিলওয়ারের প্রথম কবিতা তৎকালীন সাপ্তাহিক যুগভেরীতে প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম- 'সাইফুল্লাহ হে নজরুল'। কবিতাটি হারিয়ে গেছে। এরপর লিখেছেন অসংখ্য কবিতা, গান, ছড়া। কিন্তু সবগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এপর্যন্ত যে বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হলো- জিজ্ঞাসা (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৫৩), ঐক্যতান (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৬৪), পুবাল হাওয়া (গানের বই, ১৯৬৫), উদ্ভিন্ন উল্লাস (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৬৯), বাংলা তোমার আমার (গানের বই, ১৯৭২), ফেসিং দি মিউজিক (ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ, ১৯৭৫), স্বনিষ্ঠ সনেট (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৭৭), রক্তে আমর অনাদি অস্থি (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৮১), বাংলাদেশ জন্ম না নিলে (প্রবন্ধগ্রন্থ, ১৯৮৫), নির্বাচিত কবিতা (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৮৭), দিলওয়ারের শত ছড়া (ছড়ার বই, ১৯৮৯), দিলওয়ারের একুশের কবিতা (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৯৩), দিলওয়ারের স্বাধীনতার কবিতা (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৯৩), ছড়ায় অ আ ক খ (ছড়ার বই, ১৯৯৪), দিলওয়ারের রচনাসমগ্র ১ম খণ্ড (১৯৯৯), দিলওয়ার-এর রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড (২০০০), ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর ডাকে (ভ্রমণ, ২০০১)।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোং লি. কবির ৪টি গান দিয়ে একটি ডিস্ক বাজারে ছাড়ে। গানগুলো হলো- মুর্শিদ আমি খুঁজবো না গো, তুমি রহমতের নদীয়া, মন আমার কেমন করে, ও নদীর ঘাটে জল আনিতে গিয়া। তাঁর একাধিক গণসংগীত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছিল। সেগুলি হলো- 'মা আমার গলা ধরে বলেছে'', 'বলো বুলবুলি কি কাকের খাঁচায়', 'আয়রে চাষী মজুর কুলি', 'চলছে মিছিল চলবে মিছিল' প্রভৃতি। ৬৩-৬৪ সালের দিকে সিলেটের জালালাবাদ অন্ধ কল্যাণ সমিতির জন্য সংগীত লিখে দেন কবি দিলওয়ার।

> ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোং লি. কবির ৪টি গান দিয়ে একটি ডিস্ক বাজারে ছাড়ে। গানগুলো হলো- মুর্শিদ আমি খুঁজবো না গো, তুমি রহমতের নদীয়া, মন আমার কেমন করে, ও নদীর ঘাটে জল আনিতে গিয়া। তাঁর একাধিক গণসংগীত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছিল। সেগুলি হলো- 'মা আমার গলা ধরে বলেছে'', 'বলো বুলবুলি কি কাকের খাঁচায়', 'আয়রে চাষী মজুর কুলি', 'চলছে মিছিল চলবে মিছিল' প্রভৃতি। ৬৩-৬৪ সালের দিকে সিলেটের জালালাবাদ অন্ধ কল্যাণ সমিতির জন্য সংগীত লিখে দেন কবি দিলওয়ার।

শুধু বাংলাদেশেই নয় কলকাতার পত্রিকাগুলোতেও কবি দিলওয়ারের লেখা নিয়মিত ছাপা হয়েছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'শিশুমেলা'-য় অনেক বছর আগে তাঁর ছড়া ছাপা হয়। সত্যজিত রায় সম্পাদিত পত্রিকা 'সন্দেশ'-এ তিনি শিশুদের জন্য ছোট্ট একটি মেয়েকে নিয়ে লিখেছেন মজার ছড়া। দেবসাহিত্য কুঠির থেকে প্রকাশিত মাসিক 'সুখতারা'-য় তাঁর ছড়া ছাপা হয়। 'সুখতারা'-য় লেখা ছাপানো অনেকটা কঠিন ছিলো। কারণ তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়, বনফুলের মতো ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত জুরি বোর্ড থেকে ছাড় পাওয়ার পরে লেখা প্রকাশিত হতো। এসব মানদন্ড অতিক্রম করে 'সাদেক-সুধীন যাচ্ছিলো পথ দিয়ে' দিলওয়ারের রচিত এ রকম অনেক ছড়া ও কবিতা নিয়মিত ছাপা হয়েছে 'সুখতারা'-য়। দিলওয়ার কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি একজন শক্তিশালী ছড়াকার। তিনি শিশুদের উপযোগী করে লিখেছেন শত ছড়া। স্বরে-অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত প্রতিটি বাংলা বর্ণ দিয়ে ছড়া লিখেছেন তিনি।

কবি দিলওয়ার ধার্মিক হলেও ধর্মীয় গোড়ামি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। সেজন্যই হয়তো তিনি সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ কর্তৃক তাঁকে দেওয়া 'কেমুসাস' পদক অতি বিনয়ের সাথে ফিরিয়ে দেন। তিনি একটি সূত্রে বিশ্বাসী সেটা হলো 'জন্মগতভাবে মানুষের সন্তান, ধর্মগতভাবে মুসলিম এবং জাতিসত্ত্বায় বাঙ্গালি'।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কবিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮০ সালে কবি দিলওয়ারকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং পরে ১৯৮১ সালে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। ১৯৮২ সালে কমলগঞ্জ গণমহাবিদ্যালয় কবিকে সংবর্ধনা দেয়। ১৯৮৭ সালের ৯ আগস্ট যুক্তরাজ্যে লন্ডনস্থ সিলেট সেটারে তাঁকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী কর্তৃক সংবর্ধনা দেয়া হয়। স্বর্ণ শাপলা এবং তাম্রফলকে লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলিসহ দিলওয়ার-কে ১৯৭৮ সালের ৭ মার্চ সিলেটের সর্বস্তরের নাগরিক কর্তৃক সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ময়মনসিংহ সাহিত্য সংসদ কর্তৃক তিনি ১৯৮৬ সালে আবুল মনসুর সাহিত্য পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৮ সালে তাঁকে একুশে পদক প্রদান করা হয়। ২০০৭ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের জ্যামাইকাস্থ তাজমহল হোটেলে সংবর্ধনা প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীবৃন্দ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কবীর চৌধুরীর ভাষায়- 'কবি দিলওয়ারের সাহিত্য কর্মের জাতীয়ভাবে যথার্থ মূল্যায়ন করা হলে তিনি দেশবাসীকে নোবেল প্রাইজ উপহার দিতে পারতেন।' এছাড়া ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'কবি দিলওয়ার পরিষদ' কবির সাহিত্য কর্ম প্রকাশনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বেসরকারী উদ্যোগে।

দিলওয়ার খান ২০১৩ সালের ১০ই অক্টোবর মারা যান।

**তথ্যসূত্র:** ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারীতে কবির ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষে 'কবি দিলওয়ার পরিষদ' কর্তৃক প্রকাশিত 'দিলওয়ার' নামের ৫ম সংকলনটি থেকে নেওয়া হয়েছে।

লেখক : মৌরী তানিয়া

সহযোগিতায়:
BRAC BANK

# যতীন সরকার

ছবিটি নাসির আলী মামুনের তোলা/ফটোজিয়াম

প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে যতীন সরকারকে যুদ্ধ করে তাঁকে পড়াশুনা করতে হয়েছে। তাঁর বাবা জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র সরকারের হেমিওপ্যাথি ডাক্তারি ছাড়া আর কোনো আয়ের উৎস ছিল না। তাঁদের গ্রাম চন্দ্রপাড়ার পার্শ্ববর্তী দলপা ও নন্দী গ্রাম ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। পাকিস্তান হওয়ার পরপর ওই এলাকার লোকজন ব্যাপক হারে ভারতে অভিবাসী হয়। ফলে তাঁর বাবার আয় কমে আসে। পরিবার দারুণ আর্থিক দৈন্যের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই রামপুর বাজারে তাঁকে দোকান খুলে বসতে হয়। বাজারে চাটাই বিছিয়ে তিনি ডাল, পান, বিড়ি, বিস্কুট ইত্যাদি বিক্রি করে সংসারের প্রতিদিনের খরচ জোগাতে থাকেন।

১৯৫৪ সালে মেট্রিক পরীক্ষা দিলেও আই.এ. ক্লাশে ভর্তির টাকা জোগাড় করার জন্য তাঁকে এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। টিউশনি করে টাকা জমিয়ে ১৯৫৫ সালে যতীন সরকার উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হন নেত্রকোনা কলেজে। শহরে লজিং থেকে চালিয়ে যান লেখাপড়া। এই কলেজের ছাত্রসংসদে তিনি সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে দুর্ভিক্ষের সময় যে পরিবারে লজিং থাকতেন সে পরিবারের অভাবের সংসারে অর্থের যোগান দেওয়ার পাশাপাশি অনেকদিন সবার সঙ্গে তাঁকেও থাকতে হয়েছে অনাহারে।

নেত্রকোনা কলেজ থেকে আই.এ. পাশের পর ১৯৫৭ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে বি.এ-তে ভর্তি হন। ময়মনসিংহ শহরে লজিং থেকেই শুরু হয় তাঁর বি.এ. পড়া। ১৯৫৯ সালের বি.এ. পরীক্ষা দিয়েই শিক্ষকতা শুরু করেন নেত্রকোনার আশুজিয়া হাইস্কুলে। পরে বারহাট্টা থানা সদরের হাইস্কুলে শিক্ষকতা। এই স্কুলেই কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। ১৯৬১ সালের গোড়া পর্যন্ত প্রায় দুই বছর শিক্ষকতা করে টাকা জমিয়ে বাংলায় এম.এ. ভর্তি হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ও তাঁকে কষ্ট করে পড়াশুনার খরচ যোগাতে হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সরাসরি শিক্ষক ছিলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুস্তফা নূর উল ইসলাম। ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৩-এর অক্টোবরেই বাংলার শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর হাইস্কুলে। ১৯৬৪ সালের আগস্টে ময়মনসিংহ শহরের নাসিরাবাদ কলেজে বাংলা বিষয়ে প্রভাষক নিযুক্ত হন। ২০০২ সালে এই কলেজ থেকেই তিনি অবসরে যান।

নেত্রকোনা জেলা সদর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে কেন্দুয়া থানার রামপুর বাজার। গৌরীপুর থেকে রামপুরের ভেতর দিয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে মদন থানায়। ময়মনসিংহ থেকে নেত্রকোনা হয়ে রামপুরের ভেতর দিয়ে অপর একটি রাস্তা চলে গেছে কেন্দুয়া থানায়। এই চৌরাস্তার মোড় ঘিরে জমে উঠা রামপুর বাজারের পৌনে এক মাইলের মধ্যে চন্দপাড়া গ্রাম। এ গ্রামেই ১৯৩৬ সালের ১৮ আগস্ট (বাংলা ১৩৪৩ সালের ২ ভাদ্র) যতীন সরকারের জন্ম।

ছোটবেলায় সবাই খেলাধুলা করে। কিন্তু যতীন সরকার ছেলেবেলায় খেলাধুলার দিকে না ঝুঁকে পড়াশুনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁর বাবার কোনো ভাইবোন ছিল না। তাঁর জন্মের আগে তাঁর এক বোন পৃথিবীতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায়। বংশবিলোপের আশঙ্কায় আদরের বাড়াবাড়ির মধ্যে পড়তে হয় যতীন সরকারকে। তাঁর ঠাকুমা তাঁকে বলতেন, 'তোরে মাথায় রাখি না উকুনে খাবে, মাটিতে রাখি না পিঁপড়ায় খাবে।' কাজেই, তাঁকে খেলাধুলার সবকিছু থেকে ফিরিয়ে শুধু বইপত্রের মধ্যে একেবারে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের বাড়ি থেকে আধমাইল দূরে কবিরাজ বাড়ি। কবিরাজ জগদীশ চন্দ্র নাগ কাব্যতীর্থ সাহিত্যশাস্ত্রী বিদ্যাবিনোদ ভিষগাচার্য বেশ কয়েকটি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। যতীন সরকার ওইখানে চলে যেতেন পত্রিকা পড়তে। সেখানে 'বসুমতী' ও 'প্রবাসী'-র মতো পত্রিকাগুলোর বাঁধাই করা কপি, সাপ্তাহিক 'দেশ' এবং অন্যান্য মাসিক পত্রিকা পড়তেন তিনি। এছাড়া ঠাকুরদা রামদয়াল সরকার তাঁকে রামায়ণ, মহাভারত, রামকৃষ্ণ কথামৃত, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ইত্যাদি পড়ে শুনাতেন। বাংলার পাশাপাশি সংস্কৃত পাঠেরও শুরু পারিবারিক পরিমণ্ডলেই।

ছোটবেলার পঠনপাঠন সম্পর্কে যতীন সরকার বলেন, "আমিতো ছোটবেলায় শিশুসাহিত্য পড়িনি, শিশুসাহিত্য পড়েছি বড় হয়ে। বলতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলার মতো বই দিয়ে আমার সাহিত্যপাঠের শুরু। ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদন- এঁদের লেখা দিয়েই আমার পাঠাপাঠের গোড়াপত্তন।"

বালক বেলার রামপুর বাজারকে যতীন সরকার 'দুনিয়ার জানালা' হিসেবে অভিহিত করেন। দুনিয়ার খবরাখবর প্রথম এ বাজারেই এসে পৌঁছত এবং পরে ছড়িয়ে পড়তো গ্রামের মানুষের মুখে মুখে। রামপুরের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া ডিস্ট্রিক বোর্ডের ওই রাস্তা ধরে নেত্রকোনা আসা কিন্তু সহজ ছিল না। বর্ষাকালে প্রায় দশ মাইল পথ হেঁটে জলে-কাদায় মাখামাখি হয়ে নেত্রকোনা মহকুমা সদরে (বর্তমানে জেলা) আসতে হতো। গ্রামের কারও কারও সাইকেল ছিল। কালেভদ্রে শহর থেকে ধনীদের কেউ কেউ আসতেন ঘোড়ার গাড়িতে করে। তখন ছেলে বুড়ো সবাই ঘোড়ার গাড়ি ও শহরের মানুষ দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

রামপুর ফ্রি বোর্ড প্রাইমারি স্কুলই তাঁর বাল্যের স্কুল। ভালো ছাত্র তিনি ছিলেন না। স্কুলের পাঠ্যবইয়ের সাথে নিতান্ত পরীক্ষা পাসের জন্য যেটুকু দরকার, সেটুকু ছাড়া কোনো সম্পর্কই ছিল না। পরীক্ষায় ফেল করেননি, কোনও রকমে পাস করেছেন। পুঁথিঘর। বইয়ের দোকান হলেও এটিই ছিল ময়মনসিংহে কমিউনিস্টদের অলিখিত অফিস। সবাই জমায়েত হতো এখানেই। আর একটি আড্ডা বসতো শৈলেন রায়ের বাসায়। এই দুই আড্ডায় অবাধ যাতায়াত ছিল যতীন সরকারের। এ সময়টাতেই তাঁর হাতে আসে জোসেফ স্তালিনের 'দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান'। এ দু'টি বই তাঁর মনকে আলোড়িত করে।

যতীন সরকারের শিক্ষা ও পেশাগত জীবনের পাশাপাশি চলেছে রাজনীতি ও লেখালেখির প্রস্তুতি। নেত্রকোনা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময় সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। তখনও ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়নি। ছাত্রলীগের রাজনীতি দিয়েই শুরু তাঁর ছাত্র রাজনীতি। ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হওয়ার পর কমিউনিজমে দীক্ষা নেন তিনি। ময়মনসিংহ শহরের চন্দ্রকান্ত ঘোষ (সিকে ঘোষ) রোডে ছিল নয়া জামানা

যতীন সরকার ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সেপ্টেম্বরে বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে মুক্তিযুদ্ধে সংগঠকের কাজ করতে থাকেন। এদিকে দেশে তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্ত্রী কানন সরকারকে তাঁর বাবার পরিবারের সঙ্গে আত্মরক্ষার তাগিদে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়।

যতীন সরকারের প্রথম গ্রন্থ 'সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা' প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত তাঁর এ গ্রন্থ দিয়েই তিনি প্রাবন্ধিক হিসেবে বাংলাসাহিত্যে নিজের অবস্থান জানান দেন। এত বেশি বয়সে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের ঘটনা বাংলাসাহিত্যে আর কোনো লেখকের ক্ষেত্রে ঘটেছে বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমি প্রতিভাবান নই। আমি কষ্ট করে লিখি। যা লিখি তা-ও আবার পড়ে আমারই পছন্দ হয় না। এসব কারণে ভরসা পাইনি এবং এখনও পাই না। অন্যরা হয়ত প্রশংসা করে ঠিকই।'

এরপর একে একে প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমী থেকে 'বাংলাদেশের কবিগান' (১৯৮৬), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে 'বাঙালির সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য' (১৯৮৬), হাক্কানী পাবলিশার্স থেকে 'সংস্কৃতির সংগ্রাম', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী থেকে 'মানবমন, মানবধর্ম ও সমাজবিপ্লব'। এ প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর পাশাপাশি শিশুদের জন্য সুপাঠ্য একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'গল্পে গল্পে ব্যাকরণ' (১৯৯৪) বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যে এবং ব্যাকরণ গ্রন্থের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বাংলা একাডেমীর জীবনী গ্রন্থমালার মধ্যে চারটি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। সেগুলো হচ্ছে, 'কেদারনাথ মজুমদার', 'চন্দ্রকুমার দে', 'হরিচরণ আচার্য', 'সিরাজউদ্দিন কাসিমপুরী'। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী', 'প্রসঙ্গ মৌলবাদ' ও 'জালাল গীতিকা সমগ্র'। নন্দিত প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'জালাল গীতিকা সমগ্র' বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা।

বাংলাসাহিত্যে 'আত্মজীবনীর বিবেচনায়' এবং 'পাকিস্তান ও বাংলাদেশ' নামক দু'টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রজীবনীর যৌথতায় একটি অনন্য গ্রন্থ 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন' (সাহিত্যিকা-২০০৪)। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাস সন্ধানীদের জন্য এটি অসাধারণ একটি গ্রন্থ। তাঁর আরো দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দ্বিজাতিতত্ত্ব, নিয়তিবাদ ও বিজ্ঞান-চেতনা' (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ২০০৬), 'সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাচার' (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ২০০৭)।

যতীন সরকার বিয়ে করেন ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে বন্ধু শচীন আইচের বোন কানন আইচকে। তাঁর দুই ছেলে-মেয়ে। ছেলে সুমন সরকার ও মেয়ে সুদীপ্তা সরকার। দুই ছেল-মেয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

যতীন সরকার শুধু মানুষের চিন্তার মুক্তির জন্য লিখে লড়াই করেননি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে ভূমিকা পালন করেছেন সক্রিয়ভাবে। বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য হওয়ার মতো সাংগঠনিক সম্মানের পাশাপাশি উদীচীর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। এছাড়া ময়মনসিংহ নাগরিক কমিটি এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

যতীন সরকারের এ সাংগঠনিক ভূমিকার শুরু হয়েছিল কলেজে পড়ার সময় থেকে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। এতকিছুর মধ্যে নিজের একান্ত প্রিয় সংগঠন ময়মনসিংহের মুক্ত বাতায়ন পাঠচক্র। এখানেই যতীন সরকারের অনেক প্রবন্ধের প্রথম পাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেগুলোর আলোচনা-পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন হয়েছে। সাংগঠনিক ভূমিকার সূত্রেই তিনি ভাষা আন্দোলনের সময় নেত্রকোনার মতো অজপাড়াগাঁয়ে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে মিটিং মিছিল করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে তিনি দাঙ্গা বিরোধী ভূমিকা রাখেন।

নিজেকে ঘরকুনো স্বভাবের মানুষ বলেই মনে করেন তিনি। তারপরও ঘুরে এসেছেন চেকোস্লাভাকিয়া ভেঙে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র স্লোভাকিয়া। ২০০১ সালে ছেলের কাছে কয়েক সপ্তাহ থেকেছেন স্লোভাকিয়ার রাজধানী বাতিস্লাভায়। ৪২ হাজার বর্গমাইলের (বাংলাদেশের প্রায় সমান) এবং ৫৫ লাখ মানুষের এ দেশটিকে গভীরভাবে জানার সুযোগ হয়েছে তাঁর। এর আগে ১৯৮১ সালে গিয়েছিলেন বার্লিনে। বার্লিন তখন পূর্ব জার্মানির রাজধানী। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন গ্যাটে সম্পর্কে বলতে হয়েছিল তাঁকে। ২০০১ সালে তিনি উদীচী সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। ভারতে গিয়েছেন বেশ কয়েকবার। সর্বশেষ ২০০৫ সালে লক্ষ্ণৌয়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি।

২০১০ সালে তাঁকে স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হয়। নেত্রকোনা সাহিত্য সমাজ তাঁকে খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে। এছাড়া মনিরউদ্দিন ইউসুফ সাহিত্য পুরস্কার, শ্রুতি স্বর্ণপদক (নারায়ণগঞ্জ), ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব সাহিত্য পুরস্কার এবং প্রথম আলো বর্ষসেরা বই ১৪১১ পুরস্কার-এ ভূষিত হয়েছেন তিনি। এসবের বাইরে নেত্রকোণা উদীচী, ময়মনসিংহ সাহিত্য সংসদ ও কেন্দুয়া উপজেলাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সংগঠন তাঁকে সম্মাননা প্রদান করে।

*তথ্যসূত্র: যতীন সরকারের সঙ্গে আলোচনা এবং তাঁর লেখা 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন' গ্রন্থ থেকে এ লেখার জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে।*

*মূল লেখক : ষড়ৈশ্বর্য মুহম্মদ*

সহযোগিতায়:
BRAC BANK

# জিয়া হায়দার

জিয়া হায়দার যখন কলেজে পড়তেন তখন তাঁর বাবা হাকিমউদ্দিন শেখ বেঁকে বসলেন ছেলেকে আর পড়াবেন না। তিনি তাঁকে বললেন 'বাড়ি ফিরে আস। জমি-জিরাত দেখাশোনা কর, ব্যবসা-বাণিজ্য কর। আর লেখাপড়া করতে হবে না।' জিয়া হায়দারের মনটা ভেঙে গেল। কারণ তিনি এই হায়দার বংশের প্রথম মেট্রিকুলেট। কত স্বপ্ন তাঁর। তিনি নিজে পড়াশুনা করবেন। ভাই-বোনদের পড়াশোনা করাবেন। কিন্তু বাবার এই সিদ্ধান্তে আকাশ ভেঙ্গে পড়ল তাঁর মাথায়। আর ঠিক এই সময়ই এগিয়ে এলেন তাঁর মা রহিমা খাতুন।

স্বামীর অজান্তে নিজের গলার দামি একখানা হার বিক্রি করে তিনি ছেলেকে দিলেন পড়াশুনা করার জন্য। এ নিয়ে পরে স্বামীর অনেক গালমন্দও শুনতে হয়েছে তাঁকে। নতুন উদ্যোমে পড়াশুনা শুরু করলেন তিনি। মায়ের দেয়া হার বিক্রির সেই টাকা বৃথা যেতে দেননি জিয়া হায়দার। তিনি এদেশের খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব, কবি এবং শিক্ষক জিয়া হায়দার নামে পরিচিতি লাভ করেন।

নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জিয়া হায়দার বাংলাদেশের নাট্যকলাকে সৃজনশীলতা, প্রজ্ঞা ও সাধনায় সমৃদ্ধ করতে আমৃত্যু প্রয়াসী ছিলেন। পাঁচ খণ্ডে লিখেছেন থিয়েটারের কথা। নাটককে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে রেখেছেন বিশেষ অবদান।

জিয়া হায়দারের জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৮ নভেম্বর পাবনা জেলার দোহারপাড়া গ্রামে। পারিবারিকভাবে জিয়া হায়দারদের পরিবার ছিল বিশাল ভূ-সম্পদের অধিকারী। তাঁর বাবা সেই জমি-জমা দেখতেন। আর ঠিকাদারি ব্যবসা করতেন। মূলত পরিবারটি ছিল সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার। মা ছিলেন গৃহিণী। মাত্র ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই বিদ্যা নিয়েই তিনি শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', এমনকি 'গোরা'র মতো কঠিন উপন্যাসও বানান করে করে পড়ে ফেলেছিলেন। হায়দার পরিবারের ছেলেদের কপালে 'সাহিত্যিক' অভিধা জোটার পেছনে এই মাতৃদেবীর ভূমিকা ছিল অনেকখানি। হাকিমউদ্দিন শেখ আর রহিমা খাতুনের পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে। জিয়া হায়দার সর্ব জ্যেষ্ঠ। ডাক নাম রউফ। বাড়ির ছোটরা তাঁকে আদর করে 'সোনাভাই' বলে ডাকতেন।

জিয়া হায়দারের লেখাপড়ার শুরু তাঁর বাবারই প্রতিষ্ঠিত আরিফপুর প্রাথমিক স্কুলে। এখানে ক্লাস টু পর্যন্ত পড়াশোনা করেন তিনি। পরে চলে যান পাবনা জেলা স্কুলে। সেখানে ক্লাস থ্রি-তে ভর্তি হন। এরপর গোপালচন্দ্র ইন্সটিটিউশন থেকে ১৯৫২ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন জিয়া হায়দার।

একই বছর ভর্তি হন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে। জড়িয়ে পড়েন ছাত্র আন্দোলনের সাথে। আগে থেকেই চেনাজানা ছিল রাজনৈতিক পরিমন্ডলের লোকজনদের সঙ্গে। নিজে যেহেতু গল্প-কবিতা লিখতেন, শহরে শিক্ষিত সমাজে তাঁর একটা পরিচিতি ছিল। ফলে পাকিস্তানি শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একেবারে যুক্ত হয়ে গেলেন তিনি।

পাবনা তখন শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতির সমঝদার শহর। এ ছোট জেলা শহরটি তখন সাহিত্যের প্রতি খুবই আগ্রহী। উৎসাহী কিছু তরুণ কবিতাকর্মী ছিল এর নেপথ্যে। জিয়া হায়দার ভিড়ে গেলেন সেই দলে। তাঁর লেখা তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় হরহামেশাই ছাপা হচ্ছে। বাড়িতে গেলে নিজের ভাইদের এসব কবিতা পড়ে পড়ে শোনান। ছাপা অক্ষরে সোনাভাইয়ের নাম। ভাইদের বিস্ময় জাগে মনে। গর্ব হয় সোনাভাইয়ের জন্য।

এভাবে তিন বছর নষ্ট হওয়ায় বাবা হাকিমউদ্দিন শেখ বেঁকে বসলেন ছেলেকে আর পড়াবেন না। অবশেষে মা রহিমা খাতুনের হস্তক্ষেপে তিনি পড়াশুনা চালিয়ে যান এবং ১৯৫৬ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। এরপর ভর্তি হন রাজশাহী কলেজে। ১৯৫৮ সালে তিনি সেখান থেকে বাংলায় অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। রাজশাহী অবস্থানকালে তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে যান। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের উত্তাল-অস্থির রাজনীতি। দেশ হাঁটছে স্বাধীনতার পথে, ধীরে ধীরে। জিয়া হায়দার মাঝে মাঝেই যান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তখন সত্যিকার অর্থেই সাহিত্যের তীর্থভূমি। কবি ও সাহিত্যিক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মুস্তাফা নুর উল ইসলাম, কবি মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর, অধ্যাপক মশাররফ হোসেন, হাসান আজিজুল হক, আবদুল হাফিজ, আলী আনোয়ার সবাই মিলে যেন এক শিল্প-সাহিত্যের রাজত্ব তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেকেই তখন ছোট কাগজ সম্পাদনা করেন। গল্প-কবিতা লেখার কারণে সকলেরই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন জিয়া হায়দার। এমন পরিবেশে নিজেকে নিয়োজিত করে রাখেন কবিতা লেখায়। ঢাকার অনেক পত্রিকাতেই তখন নিয়মিত কবিতা ছাপা হচ্ছে তাঁর। সারাদিন ঘোরাঘুরি, রাতভর আড্ডা, তর্ক-বিতর্ক, শেষ রাতে আস্তানায় ফেরা। সব কিছুতেই নিজেকে লীন করে দেন। আবার গোপনে বুনে তোলেন সাহিত্যের নিজস্ব এক ঠিকানাও।

এরপর মাস্টার্স ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৬১ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তারপর কিছুদিন কাজ করেন তখনকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'চিত্রালি'-তে। মাস্টার্সের ফল বেরুবার আগেই অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে চলে যান তোলারাম কলেজে। যাবার সময় নিজের চাকরিটা দিয়ে যান ছোট ভাই রশীদ হায়দারকে। নিজের লেখালেখির জগত, চাকরি আর পরিবারের ছোট ভাই-বোনদের মানুষ করার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। এর মাঝে কিছুদিন কাজ করেন বাংলা একাডেমিতে। তারপরে পাকিস্তান টেলিভিশনে। টেলিভিশন ভবন তখন ছিল ডিআইটি ভবনে (বর্তমান রাজউক ভবন)। ১৯৬৮ সালে বৃত্তি নিয়ে চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য। পরে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সার্টিফিকেট ইন শেক্সপিয়ার থিয়েটার' ডিগ্রি অর্জন করেন।



১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে জিয়া হায়দার যোগ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে। সেখান থেকেই অবসর নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময় এবং পরে এশিয়া ইউরোপ আমেরিকাসহ সারা পৃথিবী চষে বেরিয়েছেন নাটকের প্রয়োজনে। বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বের নামি-দামি নাট্যজনদের সাথে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ২৩ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ জনতার প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জিয়া হায়দারও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাতেই সভাপতি জনতার ইচ্ছায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সভা থেকে এক বিরাট মিছিল চট্টলার রাজপথ অতিক্রম করে।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর গণহত্যা শুরু করে। ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক্যাম্পাস ছেড়ে দেয়। চট্টগ্রাম শহরের তখন পতন হয়ে গেছে। জিয়া হায়দার ফিরে আসেন ঢাকায়। ঢাকা তখন অবরুদ্ধ। অবরুদ্ধ ঢাকাতেই হায়দার পরিবারের ছেলেরা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন। রশীদ হায়দার তখন খিলগাঁওয়ে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। সেখানেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কিছু কাজ হত। যদিও ছোট ভাই জাহিদ হায়দার সরাসরি যুদ্ধ করার জন্য ভারত গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি পরে আবার ফিরে আসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একটি মেয়েকে ভালবাসতেন। সবাই জানত তাঁদের বিয়ে হবে কিন্তু হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে গেলেন, সেখানে এক সহপাঠীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন আবেগময় সম্পর্কে। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওই 'মেম'-এর সঙ্গে যোগাযোগ ও গভীর টান থাকলেও এক ছাদের নীচে বাস করা হয়নি তাঁদের। মা, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সবার অনুরোধে-উপরোধে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেন এক অধ্যাপিকাকে, ১৯৭৫ সালের ২৩ জুন। অধ্যাপিকা ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। কিন্তু সে বিয়েও টেকেনি। কারণ অধ্যাপিকা ছিলেন সিজনাল মানসিক রোগী। সেটা বিয়ের পর ধরা পড়ে। কিন্তু কিছুই করার ছিল না জিয়া হায়দারের। চিকিৎসার সব রকম চেষ্টাই করেন তিনি। অবশেষে সেই সংসারও ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীতে বিয়ের সেই তারিখ আর নিজের বিড়ম্বিত ভাগ্য নিয়ে রসিকতা করে বলতেন, '১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল।'

এই বিড়ম্বিত ভাগ্য নিয়েই সারাটা জীবন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি আর সেখানকার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে কাটিয়ে দিলেন জিয়া হায়দার। খুব একটা প্রয়োজন ছাড়া ঢাকায় আসতেনও না। দূর থেকে আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতা করার যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন। চট্টগ্রামের ব্যস্ততম এলাকার লালখানবাজার মোড়ের ইস্পাহানি বিল্ডিংয়ে শুধু রাশি রাশি বই আর তার ব্যক্তিগত অজগ্র অসংখ্য স্মৃতিভার অবলম্বন করেই বেঁচে ছিলেন জিয়া হায়দার। এটা সন্ন্যাস নয়। নয় বুদ্ধের মতো গৃহত্যাগও। কিন্তু নিঃসঙ্গ। বিপুল এক শূন্যতা নিয়েই সমস্ত জীবন কেটেছে তাঁর।

এই অবস্থাতেই শেষ জীবনে এসে আক্রান্ত হলেন মরণব্যাধি ক্যান্সারে। ২০০৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন নাট্যজন জিয়া হায়দার। তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় জন্মস্থান পাবনার দোহারপাড়ার আরিফপুর গোরস্থানে।

জিয়া হায়দারের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-একতারাতে কান্না (১৯৬৩), কৌটার ইচ্ছেগুলো (১৯৬৪), দূর থেকে দেখা (১৯৭৭), আমার পলাতক ছায়া (১৯৮২), লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভালবাসা ভালবাসা। নাটকঃ শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ (১৯৭০), এলেবেলে, সাদা গোলাপে আগুন ও পংকজ বিভাস (১৯৮২)। রূপান্তরিত নাটকঃ প্রজাপতি নির্বন্ধ, তাইরে নাইরে না, উন্মাদ সাক্ষাৎকার, মুক্তি মুক্তি। অনূদিত নাটকঃ দ্বার রুদ্ধ, ডক্টর ফস্টাস, এ্যান্টিগনে। প্রবন্ধঃ নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ, থিয়েটারের কথা (১ম-৫ম খন্ড), বাংলাদেশের থিয়েটার ও অন্যান্য রচনা, স্ট্যানিসলাভস্কি ও তার অভিনয় তত্ত্ব, নাট্যকলার বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার, বিশ্বনাটক।

**তথ্যসূত্র :** এই লেখাটি তৈরির জন্য ফেব্রুয়ারী, ২০১০-এ জিয়া হায়দারের ছোট ভাই সাহিত্যিক রশীদ হায়দারের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এছাড়াও বাংলা একাডেমির চরিতাভিধান ও রশীদ হায়দার রচিত 'জিয়া হায়দার : আমাদের সোনাভাই' থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

লেখক : চন্দন সাহা রায়

ব্র্যাক ব্যাংক সমকাল
সাহিত্য পুরস্কার ২০১৩

ব্র্যাক ব্যাংক ও সমকাল 'সাহিত্য পুরস্কার'-এর তৃতীয় বছর এবার।
বাংলাদেশের সাহিত্যের মৌলিক সৃষ্টিকর্মকে উৎসাহ প্রদানই এই পুরস্কারের লক্ষ্য

যে সকল শাখায় পুরস্কার দেওয়া হবে

- কবিতা ও কথাসাহিত্য
- প্রবন্ধ, আত্মজীবনী, ভ্রমণ ও অনুবাদ
- হুমায়ূন আহমেদ পুরস্কার [তরুণ সাহিত্যিকদের জন্য]

প্রথম দুই শাখার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচয়িতা
প্রত্যেকে এক লাখ ও তরুণ সাহিত্যিক
পাবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার।

২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত মৌলিক সাহিত্যকর্ম প্রতিযোগিতার জন্য গৃহীত হবে।
অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর বয়সী লেখকরা তরুণ সাহিত্যিক পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের মধ্যে ছয় কপি গ্রন্থ জমা দিতে হবে।
পুরস্কার প্রদান এপ্রিলে।

যো গা যো গে র ঠি কা না

ব্র্যাক ব্যাংক সমকাল সাহিত্য পুরস্কার ২০১৩, সাহিত্য বিভাগ, সমকাল
১৩৬, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮, ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫
ই-মেইল : kalerkheya.samakal@gmail.com

সম্পাদক : **ঊর্মি লোহানী,** প্রকাশক : গুণীজন ট্রাস্ট, মুদ্রণে : পাথওয়ে, অলংকরণ : আমিনুল ইসলাম আমিন, শব্দবিন্যাস : মো. শাহজাহান কাজী, যোগাযোগ : ৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ই-মেইল : info@gunijan.org.bd ওয়েব : www.gunijan.org.bd, ফোন : +৮৮০২-৮১৫৬৭৭২, ৮১২৪৯৭৬, ৯১৩১৪২৪, ফ্যাক্স : +৮৮০২৮১৪২০২১